International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
*Volume-II, Issue-*VIII*, September 2016, Page No. 1-6*
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বারাকপুরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস (১৭৭২- ১৮৫৭)

অভিজিৎ বাগ
ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

'Barrackpore' is a Historical place near Kolkata. There was a 'Barrack' established in 1772 at Barrackpore; therefore the place was known as Barrackpore according to W.W. Hunter's A Statistical Account of Bengal, vol-1. But there is a debate regarding to the origin of the name of 'Barrackpore' ; it is because the same place was known as 'Chanak' before 1772 A.D. which we know from the work namely "Manasa Bijoy"(1495A.D.) composed by Bipradas Pipilai. There also is a doubt whether this place was named as 'Chanak' after the name of Job Charnock. It had been a period of total socio-political change after the establishment of Barrackpore Cantonment, here. There were a park, Zoo, Government house etc came into existence during this period. Lord Wellesley was very pleased and impressed by the natural beauty of this place. He was very enthusiastic about this cantonment; therefor he wanted to make it a good city like Calcutta. His intention were to shift all the departments of government offices to Barrackpore. This cantonment has been a strategically very sensitive area since its foundation. There were two big mutinies took place in this small city. But, both of the revolts were severely put down by the military authorities. So, unambiguously, this cantonment city was very important for the British rule in India

Key words: Historic place, Chanak, Cantonment, natural beauty, park, zoo, social change, revolts.

বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত ও কলকাতা থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত **'বারাকপুর'** একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। আকবরের সভাসদ্ আবুলফজল এর **'আইন-ই-আকবরী'** গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সুবা বাংলাকে উনিশটি সরকার এবং ৬৮২ টি মহালে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই উনিশটি সরকারের একটি ছিল সাতগাঁও সরকার। **বরবাকপুর** নামে দুটি মহাল ছিল এই সাতগাঁও সরকারের অধীন।[১] ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করে।[২] এই পরগনার অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল **বারাকপুর**। বারাকপুরের পূর্ব নাম ছিল **'চানক'**।[৩] দিগঙ্গ (বর্তমান মনিরামপুর) থেকে বুড়নিয়ার দেশ অর্থাৎ বর্তমান টিটাগড় পর্যন্ত অঞ্চল **'চানক'** নামে পরিচিত ছিল। অনেকের মতে, জব চারনক এর নাম থেকেই এই অঞ্চলের নাম **'চানক'** হয়েছে। তবে তা ঠিক নয়, কারণ; **'চানক'** জনপদের নাম প্রথম পাওয়া যায় বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত **'মনসা বিজয়'**কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যগ্রন্থ রচিত ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে। চাঁদসদাগরের সিংহল বাণিজ্যযাত্রাকে উপলক্ষ্য করে লেখক তাঁর এই রচনা সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থের একটি চরণ হল; "চাণক্য বাহিয়া যায় বুড়নিয়ার দেশ, তাহার

মেলান বাহে আকনা মাহেশ।"[৪] এদিকে জব চারনক কলকাতায় প্রথম এসেছিলেন ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে। তাছাড়া '**সুরধুনী**' কাব্যের লেখক কবি দীনবন্ধু মিত্রের লেখাতেও '**চানক**' নাম পাওয়া যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের কিছুটা সময় পরে লিখিত এই কাব্যে ' **চানক**'কে 'সশস্ত্র চানক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫] এছাড়াও vanden Brouche - র ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের নকশায় (Tsjannock) **'চানক'** এর অবস্থান দেখান হয়েছে কাঁকিনাড়া (Cangnerre) এবং বরানগর (Barrenger) - র মধ্যবর্তী অঞ্চলে।[৬] যাইহোক বারাকপুরের পুরানো নাম যে '**চানক**' ছিল তার বেশ কিছু স্মৃতি এখানে এখনও রয়ে গেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই স্থানটি '**বারাকপুর**' নামে পরিচিত হয়। **বারাকপুর** সেনানিবাসের ইতিহাস জানতে হলে প্রথমে এই নামের উৎস জানা প্রয়োজন। তবে **বারাকপুর** নামের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতবিরোধ আছে। প্রচলিত মতটি হল ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে এখানে সেনাছাউনি (Cantonment) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উক্ত স্থানের নামকরণ '**বারাকপুর**' হয়েছে। অনেকে আবার মোঘল সেনাপতি বারবাক শাহের নাম থেকে এই স্থানের নামকরণ **'বারাকপুর'** হয়েছে বলে মনে করেন।[৭] তবে তৃতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যায়, মোগল শাসক আকবরের আমলে সমগ্র সুবা বাংলাকে কতগুলি সরকার ও মহালে ভাগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে সরকার সাতগাঁও ছিল অন্যতম, এর রাজধানী ছিল সপ্তগ্রাম। এই সরকার ৫৩টি মহালে বিভক্ত ছিল। আকবরের সভাসদ্ আবুল ফজলের '**আইন-ই-আকবরী**' গ্রন্থে দুটি মহালের নাম **বরবাকপুর** বলে উল্লেখ আছে।[৮] তার মধ্যে কলকাতা থেকে নিকটবর্তী এক বরবাকপুরের নাম পাওয়া যায়। এই **বরবাকপুর** মহাল থেকেই আজকের **'বারাকপুর'** শহরের নামটি এসেছে। এই শেষ মতবাদটি বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়; কারণ সেনাছাউনি বা ব্যারাক থেকে **বারাকপুর** শহরের নাম হয়েছে এর স্বপক্ষে প্রমাণ অতি দুর্বল। কারণ হিসেবে বলা যায় ইংরেজ আমলে বা কোম্পানির সময়কালে সুন্দরবনে সেনা রাখা হলেও সেস্থানের নাম **বারাকপুর** হয়নি। এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য যে, খুলনা জেলায় যে কটি স্থানে **বারাকপুর** নামের গ্রাম আছে, সেইসব স্থানে সৈন্য রাখার দৃষ্টান্ত নেই। সুতরাং **ব্যারাক** প্রতিষ্ঠার সাথে এ অঞ্চলের **'বারাকপুর'** নামাঙ্কিত হওয়ার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। তাছাড়া কোনও মোঘল সেনাপতির নামে কোন স্থানের নামকরণ হয়েছে, এমন উদাহরণ প্রায় নেই বললেই চলে। যাইহোক W.W. Hunter এর **A Statistical Account of Bengal, vol- 1** এ ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দকে বারাকপুরের সেনানিবাস প্রতিষ্ঠার বছর ও তার পর থেকেই এই অঞ্চলের নাম **বারাকপুর** হয়েছে বলে উল্লেখ্য আছে। তবে ১৭৭২ বা ১৭৭৫[৯] খ্রিস্টাব্দে বারাকপুরে সরকারিভাবে সেনাছাউনি প্রতিষ্ঠা করে হলেও এই সেনানিবাসের প্রকৃত কাজ শুরু হয়েছিল ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে।[১০]

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দকে বারাকপুরে সরকারিভাবে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠার বছর হিসেবে ধরা হয়। এরপর থেকেই ধীরে ধীরে এই অঞ্চল শহর রূপে গড়ে উঠতে থাকে। সবরকম আধুনিক সুযোগসুবিধা যেগুলি সেসময়কালের কলকাতায় পাওয়া যেত; সেগুলি এরপর থেকে বারাকপুরেও পাওয়া যেতে থাকে। এই সময় থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা পরে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের অন্যতম ঘাটি হিসেবে এই শহরের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। কলকাতা থেকে কাছেই সবুজ গাছগাছালি ও অরণ্য ঘেরা জনপদ ছিল বারাকপুর। বড়লাট বা গভর্নর জেনারেল, উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী প্রমুখদের পরিবার পরিজন ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে নির্জন নিরালয়ে ছুটি কাটানোর আদর্শ জায়গা ছিল এই ছাউনি শহর। প্রশাসনিক ও সামরিক দিক থেকে এই শহর লর্ড ক্লাইভের সময় থেকে আজও পর্যন্ত বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গঙ্গা নদীর পূর্বপাঁড় ও প্রকৃতির কোলঘেঁষা অবস্থানের কারণে ইংরেজ কর্মচারীদের সারা সপ্তাহের কলকাতা শহরের কোলাহল ও ব্যস্ততা এবং এক ঘেয়েমি জীবন ছেড়ে সপ্তাহশেষে শরীর ও মনকে সতেজ ও সবল করে তোলার এক শান্ত ও নিসর্গশোভা এখানে বিরাজ করত। সবুজ বনানী এবং আম, জাম, লিচু ও কাঁঠালের বাগান ও নানা ঝোপঝাড়ের সঙ্গে গঙ্গানদীর সৌন্দর্য এই জায়গাকে অনবদ্য রূপ দান করেছে। সেই সময়ে এই ছাউনি শহরের আভিজাত্য ও বনেদিয়ানার নিদর্শনগুলির মধ্যে ছিল; ঘোড়ায় টানা বাস, লাটভবন, পার্ক, চিড়িয়াখানা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ ইত্যাদি। **বারাকপুর** সেনানিবাস এলাকার মধ্যে ঘোড়দৌড়ের মাঠে

(প্রতিষ্ঠা ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ) ইংরেজদেরই একাধিপত্য ছিল তা বলাইবাহুল্য। তবে খেলা দেখতে এখানে নেটিভরা (দেশীয় মানুষ) ভিড় জমাতেন, বিশেষ করে ছুটির দিনগুলিতে এই খেলা জমে উঠত।

গভর্নর জেনারেলদের কাছে এই ছাউনি শহর বেশ আকর্ষণীয় ও পছন্দের গন্তব্যস্থান ছিল। এদের মধ্যে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি এই শহরকে এত ভালবেসে ফেলেছিলেন যে তিনি বারাকপুরকে **'ইংল্যান্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ'** হিসেবে গড়ে তুলতে সচেস্ট হয়েছিলেন।[১১] তাই বা সেইজন্যেই তিনি কলকাতা থেকে সমস্ত সরকারি দপ্তর এই বারাকপুরে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। যদিও তা সফল হয়নি । তবে তিনি বাংলার গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব নিয়ে বারাকপুরে আসার আগেই এখানকার সেনানিবাস সংলগ্ন স্থানে ৭৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এখানে দুটি বাংলো ছিল যেখানে **কমান্ডার-ইন-চীফ** বাস করতেন। কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি সি. আই. সি. -র জন্যে ৫০০ টাকার ভাতার ব্যবস্থা করে তার আলাদা একটা থাকার জায়গা নির্ধারণ করলেন । এরপর ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে পয়লা ফেব্রুয়ারী ওয়েলেসলি বাড়িটির দখল নেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন থাকার পর এই বাড়ি তাঁর অপছন্দ হওয়ায় কলকাতার রাজভবনের (১৮০১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা) মত বারাকপুরেও একটি **Country House** নির্মাণ করতে প্রয়াসী হন। এই **Country House** রাজভবন নামে পরিচিত ছিল। এটি গঙ্গানদীর একেবারে পাঁড়ে গড়ে উঠেছিল। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের সামরিক সচিবের বসবাসের জন্য ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউস নির্মিত হয়েছিল। তিনি অর্থাৎ ওয়েলেসলি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসবহুল নির্মাণে বিশ্বাসী ছিলেন । তবে বারাকপুরের 'রাজভবন' তৈরির কাজ আসমাপ্ত রেখেই তাকে এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল । তার কারণ ছিল এই যে, বিলেতের কোর্ট অব ডাইরেক্টর ওয়েলেসলির অমিতব্যয়িতার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ওয়েলেসলির অত্যাধিক ব্যয়সাপেক্ষ নির্মাণ কাজ সমর্থন না করায়, এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপরেও সেনানিবাসের কাছাকাছি প্রায় ৩৫০ একর জমি তিনি অধিগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে এই জমিতে থাকা সমস্ত জঙ্গল ও জলা ভূমি এবং ঝোপঝাড় সব সংস্কার করে একটি সুন্দর পার্ক তৈরি করা হয়। বিশিষ্টজনের থাকার জন্যে আরও দু-চারটি সরকারি বাংলো গড়ে ওঠে। তিনি এখানে বাগান তৈরি করেন এবং সমগ্র অঞ্চলকে এক অনন্য রূপ দিতে সক্ষম হন। এই পার্ক ও বাগানের কিছুটা অংশ নিয়েই তৈরি করা হয়েছিল পশুশালা বা চিড়িয়াখানা (১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ)।[১২] তবে তাঁর সাধের বারাকপুরে লর্ড ওয়েলেসলি খুব বেশিদিন থাকতে পারেননি; কারণ ইংল্যান্ডের কোর্ট অব ডাইরেক্টর তাঁকে গভর্নর জেনারেলের পদ থেকে সরিয়ে দেন।

লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ) পদত্যাগ করে বারাকপুর ছাড়লেও এই শহরের উন্নয়নের গতি থেমে থাকেনি। একসময় এই নির্মীয়মাণ বাড়িটি (Country House) ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এই বাড়িটির ৭০০ গজ উত্তর-পূর্বে ওয়েলেসলি আরও যে একটি ভবন নির্মাণ করেছিলেন, তা ধীরে ধীরে **লাটভবন** হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল জর্জ বারলো (১৮০৫- ০৭ খ্রিস্টাব্দ) -র আমলে এই ভবনের দক্ষিণের বারান্দার কোণগুলিকে কয়েকটা ঘরে পরিণত করা হয়। লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-২৩ খ্রিস্টাব্দ) উক্ত ভবনটিকে আরও প্রশস্ত করে গাড়ি বারান্দা তৈরি করেন। লর্ড অকল্যান্ড এর আমলে (১৮৩৬-৪২ খ্রিস্টাব্দ) এর পশ্চিমদিকে ব্যালকোনির ব্যবস্থা করা হয়। লর্ড লিটনের আমলে (১৮৭৬-৮০ খ্রিস্টাব্দ) আগের পুরানো সিঁড়ি ভেঙে নতুন সিঁড়ি তৈরি করা হয়। পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪ খ্রিস্টাব্দ) সিঁড়ির কাছে কাঠের খিলান তৈরি করলেন। লর্ড দ্বিতীয় মিন্টো (১৯০৫-১১খ্রিস্টাব্দ) এখানে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করে সমস্ত ভবনটিকে আলোকিত করেছিলেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল **লাটভবন**। এই লাটভবন সংলগ্ন সমগ্র অঞ্চল **লাটবাগান** নামে পরবর্তীকালে পরিচিত হয়। অনেক পরে এই লাটবাগানে একটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় গড়ে ওঠে, যা বর্তমানে লাটবাগান উচ্চবিদ্যালয় নামে পরিচিত।

লর্ড ওয়েলেসলির আমলে তৈরি **চিড়িয়াখানা** একসময় বারাকপুর অঞ্চলের বিনোদনের একমাত্র কেন্দ্র ছিল। নানা শ্রেণির জীবজন্তু, পাখি প্রভৃতি নিয়ে এই পশুশালাটি গড়ে উঠেছিল। তাঁর সময়কালেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে

বিভিন্ন প্রকার ও প্রজাতির জীবজন্তু বারাকপুর চিড়িয়াখানায় আনা হয়েছিল। তাছাড়া এইস্থানে নানা শ্রেণির বৃক্ষরাজি যেমন; শাল, সেগুন, বট, তাম্বুল প্রভৃতি রোপণ করা হয়েছিল। পশুশালার জীবজন্তুর প্রতি সবসময় নজর রাখা হত। লর্ড ওয়েলেসলির ব্যক্তিগত চিকিৎসক স্যার ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন (১৭৯৪-১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ) পরে এই পশুউদ্যানের বন্য প্রাণীদের চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে বারাকপুর রেলস্টেশনের কাছেই একটি ছোট জায়গা **চিড়িয়ামোড়** নামে পরিচিত; যা এখনও ইংরেজ আমলের চিড়িয়াখানার স্মৃতি বহন করে চলেছে। তৎকালীন ভারতের বড়লাট গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংক বারাকপুরে হাতির পিঠে শোভাযাত্রায় বেরতেন। এখানে বাঘ, হাতি প্রভৃতি বন্য হিংস্র প্রাণী সংরক্ষণ ও দেখভালের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল । বড়লাট লর্ড অকল্যান্ড (১৮৩৬-৪২) এঁর ভগিনী লেডি ইডেন বারাকপুর পশুশালা নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের আর এক বড়লাট লর্ড লিটনের (১৮৭৬-৮০খ্রিস্টাব্দ) আমলে বারাকপুর পশুশালার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এই সময় কলকাতার আলিপুরে নতুন এক **চিড়িয়াখানা** তৈরি হলে এখান থেকে (বারাকপুর) পশু, পাখি সবই সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে, বারাকপুর পশুশালায় যে কচ্ছপটি ছিল তা পরে আলিপুর চিড়িয়াখানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কয়েক শতকের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা প্রাণীটি এই কয়েক বছর হল মারা গেছে।

কুমারী ইডেন বারাকপুর অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন একজন চিত্র শিল্পী। তিনি এই স্থানের বেশ কিছু ছবি লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ছবির প্রশংসা করা হয়েছিল । যাইহোক, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বারাকপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কালের পরিবর্তনে আজ তা **বারাকপুর গভর্নমেন্ট স্কুল** নামে পরিচিত। আজ এই স্কুল শুধু বারাকপুর নয়, সমগ্র মহকুমায় তথা পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রথম সারির বাংলা মাধ্যম উচ্চবিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত হয়। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিলাতে গিয়েও ভুলতে পারেননি। তিনি তাঁর ছাত্রদের **'মাই ডিয়ার লিটিল বারাকপুরিয়ান'** বলে সম্বোধন করতেন।[১৩] ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় থেকে অনেক ছাত্রই আজ দেশ বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন ছাত্র ডঃ ভোলানাথ বসুর নামাঙ্কিত বারাকপুর মহকুমা হাসপাতাল বর্তমানে একটি আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাছাড়া গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ও লেডি ক্যানিং বারাকপুর শহরকে খুবই পছন্দ করতেন। তাঁদের সমাধি বারাকপুর লাটবাগানে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছে। এখানে একটি বিষয় বেশ উল্লেখ্য যে, আজ বাঙালি **লেডিকিনি** নামে যে মিষ্টির সঙ্গে পরিচিত তা তাঁরই নামাঙ্কিত।

তবে বর্তমানে বারাকপুরের গভর্নরের **Country House**; পুলিশ হাসপাতাল এবং ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউস; রাজভবনের মর্যাদা পায়। এখনও বারাকপুর রাজভবনের বাগানে চাষ করা শাঁক-সব্জি, আনাজ কলকাতার রাজভবনে পাঠানো হয়। বারাকপুর রেলস্টেশনও একটা ঐতিহ্যশালী নির্মাণকাজের উদাহরণ ও ব্রিটিশ স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন হিসেবে সুপরিচিত। এই স্টেশনের কাছেই ওল্ড ক্যালকাটা রোড রয়েছে, একসময় মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে কৃষ্ণনগর হয়ে বারাকপুরের এই রাস্তাই কলকাতা যাওয়ার একমাত্র স্থলপথ ছিল। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা এই রাস্তা দিয়ে একসময় যাতায়াত করতেন।[১৪] বর্তমান বারাকপুর চিড়িয়ামোড় থেকে যে বি. টি. রোড শুরু হয়েছে তা কলকাতার ধর্মতলা পর্যন্ত (শ্যামবাজার হয়ে) গেছে। এই একাশি নং বাস রুটে একসময় ঐতিহ্যশালী ঘোড়ায় টানা বাস চলাচল করত। লর্ড ওয়েলেসলি এ রাস্তা নতুন করে তৈরি করেন। সেইসময় জলপথ ছাড়াও স্থলপথে কলকাতা যাতায়াতের জন্য এই রুটের উপর নির্ভর করতেন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী থেকে শুরু করে গভর্নর জেনারেল পর্যন্ত মর্যাদাসম্পূর্ণ ব্যক্তিবর্গরা। বারাকপুর শহরের দ্রুত প্রগতির জন্য সেনাছাউনির অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে, তা বলাইবাহুল্য। তাছাড়াও ছাউনি শহর হওয়ায় কলকাতার কাছে বারাকপুরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কলকাতার সন্নিকটস্থ হওয়ায় এবং সামরিক ও কৌশলগত অবস্থানের জন্য এই শহর আজও অগ্রগতির পথে দ্রুত ধাবমান।

উক্ত সময়কালের মধ্যে বারাকপুরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করতে হলে এই সেনানিবাসে সংঘটিত দু-দুটো সিপাহি বিদ্রোহের কথা আমাদের আলোচনা করতেই হবে। মাত্র তিন দশকের ব্যবধানে কেন এত বড় মাপের দুটি সিপাহি অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছিল এবং কোম্পানি সরকার কেন তা অতি কঠোরভাবে দমন করলেন তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত খুব বেশি আলোচনা বা গবেষণা করা হয়নি। তবে এই দুটি বিদ্রোহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের মূল উদ্দ্যেশ্য নয়। বরং উক্ত বিদ্রোহগুলি কিভাবে বারাকপুরের সাধারণ নাগরিক সমাজ ও সিপাহিদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছিল তার প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করাই এর মুখ্য উদ্দ্যশ্য। প্রথমে ১৮২৪ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করলে (Government records) দেখা যাবে যে; সিপাহিদের ধর্মনাশ, জাতপাত, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলিকে এই বিদ্রোহের পিছনে প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়েছে এবং মুখ্যদিকগুলি যেমন; ডবল ভাতার দাবি নাকচ হওয়া, ন্যাপস্যাকের অভাব, বলদ গাড়ির সুব্যবস্থা না থাকা ছাড়াও ব্রিটিশদের বার্মা অভিযানে শোচনীয় ফলাফল ও এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী সিপাহিদের চরম দূরাবস্থা, সেখানকার খারাপ আবহাওয়া এবং এর বেশ কিছু বছর আগে এক দেশীয় সিপাহি বোঝাই জলযানের সাগরে সলিল সমাধির ঘটনা সিপাহিদের আতঙ্কিত করেছিল ইত্যাদি বিষয় গুলিকে গৌণ কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এদিকে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের বার্মা অভিযানে সিপাহিদের অংশগ্রহণ না করার মানসিকতা ও বিদ্রোহী মনোভাব কোম্পানি সরকারকে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের ভেলর বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়েছিল। তাই একদিকে বার্মা অভিযানের বাধ্যবাধকতা ও অন্যদিকে সিপাহিদের (২৬, ৬২, ও ৪৭ নং রেজিমেন্ট)[১৫] অভিযানে অংশ না নেওয়ার অনড় মনোভাব এবং দেশীয় সৈনিকদের প্রতি কোম্পানির সামরিক বাহিনীর প্রতিশোধস্পৃহ মানসিকতা এক চূড়ান্ত ও নির্মম পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায়। শেষে কমান্ডার ইন চীফ স্যার এডওয়ার্ড প্যাজেটের নির্দেশে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ ১লা নভেম্বরের মধ্যরাতে বিদ্রোহী সিপাহিদের কামানের গোলায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল[১৬] এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এই দমনমূলক মনোভাব বাহিনিতে দেশীয় সিপাহীদের ভীত করলেও তাঁরা এই বিদ্রোহের ফলে মৃত সৈনিকদের শহিদের মর্যাদা দিয়েছিলেন। বারাকপুর অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও সিপাহীদের জীবনে এই সরকারি দমনপীড়নমূলক নীতির একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। সিপাহীরা সেনাবাহিনীর প্রতি আর আশ্বাস রাখতে পারেননি। সাধারণ মানুষ কোম্পানির শাসনের কুফল অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কারণ, ১৮২৪ এর সিপাহী বিদ্রোহ থেকে অনেক দিক থেকেই স্বতন্ত্র ছিল। মহাবিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে গরু ও শুয়োরের চর্বি দ্বারা নির্মিত বন্দুকের কার্তুজ ব্যবহারকে নির্দেশ করা হলেও এই অসন্তোষের প্রকৃত কারণ নিহিত ছিল দেশীয় সিপাহিদের প্রতি কোম্পানির দৃষ্টিভঙ্গি। এদেশের সমাজ ব্যবস্থায় কোম্পানির অযাচিত হস্তক্ষেপ ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভারতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার যা ব্রিটিশ শাসনের চোখে কূ-সংস্কার ছাড়া আর কিছু ছিল না। একদিকে ভারতীয় সনাতন বিশ্বাস ও বংশপরম্পরায় চলে আসা ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা ও অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের চিরন্তন আলোকিত এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত বিদেশী শাসকেরা এদেশের মানবিক তথা সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য ছাড়াও উপনিবেশের বাসিন্দাদের প্রতি নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার মানসিকতা থেকে কিছু আধুনিক ও সমাজসংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্মিলিতভাবে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। যাইহোক এই বিদ্রোহের প্রভাব ভারতের অন্যান্য স্থানে কমবেশি পড়লেও বারাকপুরের জনজীবনে এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কোনও প্রভাব অনুভূত হয়নি।

শেষে একথা বলা যায় যে, বারাকপুরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করতে হলে এখানকার সেনানিবাসের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কারণ; সেনাছাউনিকে কেন্দ্র করেই এখানে এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বারাকপুরের সামরিক ঘাটিতে কর্মরত সব দেশীয় সিপাহি বাংলার বাইরে থেকে আসতেন। এই সিপাহিরা ছিলেন বিশেষ করে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের হিন্দিভাষী মানুষ। যাঁদের সঙ্গে স্থানীয় বাঙালি সমাজের স্বাভাবিকভাবেই ভাষার ব্যবধান ছিল। তবে যাইহোক; সেনানিবাসের ইতিহাসই যেহেতু বারাকপুরের সামাজিক ও

রাজনৈতিক ইতিহাসের মূলবিষয় তাই সেনানিবাসের প্রকৃত ও যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাস আলোচনা করলে এ অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক আঙ্গিকের এক স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাবে। এখানে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট যে, বারাকপুরে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই অঞ্চলে এক ধরনের পরিবর্তন ধীরে ধীরে সূচিত হতে থাকে। কারণ; সেনাছাউনিকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি অন্যদিকে একে কেন্দ্র করে বেশ কিছু মহল গড়ে উঠেছিল- যেমন মুরগি মহল, সবজি মহল ইত্যাদি। এই বাজার আবার নেটিভদের বাজার ও গোড়াদের বাজার এই দুভাগে বিভক্ত ছিল। এই বাজারে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বারাকপুর সামরিক বিভাগে চাকরি সূত্রে আগত সৈন্যদের যাতায়াত ছিল অর্থাৎ যারা সেনানিবাসে কাজ করতেন তাঁরা বাজারে পণ্য ক্রয় করতে আসতেন; এদের কথা বলা হচ্ছে। বাজারে আনাজ বা নানা খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বসতেন বাঙালি খেটেখাওয়া দরিদ্র মানুষজন। তবে ইউরোপীয় সৈনিকরা এদেশীয় মানুষদের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করতেন না। এছাড়া সৈন্যদের জন্য এখানে পতিতালয়ও ছিল।[১৬] এই পতিতালয়ে প্রতি সন্ধ্যাবেলায় দেশীয় ও গোড়া সৈন্যদের ভিড় জমত। এই পতিতালয়গুলি স্বাভাবিকভাবেই এদেশীয় গরীব মহিলাদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম ছিল। এথেকে একটা বিষয় অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, তৎকালীন বাঙালি সমাজে এইসব মেয়েদের কি চোখে দেখা হত। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে সন্ধ্যাবেলায় দেশীয় সিপাহীরা বাজারের কাছাকাছি কোনও গাছতলায় বসে নেশাও করতেন; কারণ এই সময়টুকুই ছিল তাদের আরাম ও অবসর সময়। তাই একথা বলা বাহুল্যই যে, সেনানিবাসকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে একটা পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যা আজও বজায় আছে।

তথ্যসূত্র :

১.The Ain-I-Akbari, vol-2, by Abu-L-Fazl Allami; translated into English by Colonel H.S. Jarrett, published by Crown publications, first reprint 1988, New Delhi, p-154

২.পলাশী থেকে পার্টিশন আধুনিক ভারতের ইতিহাস, বন্ধ্যোপাধ্যায় শেখর, অনুবাদ; রায় কৃষ্ণেন্দু, প্রকাশক; ওরিয়েন্ট লং ম্যান, কলকাতা, পৃঃ ৪৮

৩.বারাকপুরের সেকাল একাল, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা; রায় কানাইপদ, নগর পেরিয়ে - র উদ্যোগে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশকাল; ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ; ২০০১, পৃঃ ৪

৪. তদেব;

৫. তদেব; পৃঃ ৫

৬. তদেব;

৭. বারাকপুরের কাহিনিকার সেকাল একাল বীক্ষা, সম্পাদনা; রায় আনন্দপ্রসাদ, প্রকাশক; মণ্ডল অসীমকুমার, কলকাতা; ২০১০, পৃঃ ০৯

৮. তথ্যসূত্র নং - ১, তদেব;

৯. তুলসী পাতা গংগাজলের শপথঃ বারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ ১৮২৪, বন্ধ্যোপাধ্যায় প্রেমাংশুকুমার, কে. পি. বাগচী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ ১৪

১০. তদেব;

১১. ঐতিহ্যের আলোকে চানক বারাকপুর, রায় কানাইপদ, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ২৪

১২. তদেব; পৃঃ ২৯

১৩. তদেব; ৪৪

১৪. তথ্যসূত্র নং ৩; তদেব; পৃঃ ১৯৪

১৫. তুলসী পাতা গংগা জলের শপথঃ বারাকপুরের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ ১৮২৪; তদেব; পৃঃ ৩৮

১৬. তদেব; পৃঃ ৬৭, ৬৭,৬৯,৭০